২. উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক কথ্যভাষার প্রয়োগ 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে তা আলোচনা কর।

বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তুলসী লাহিড়ী। তিনি একাধারে ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা, গ্রামোফোন কোম্পানির সুরকার ও বাংলা ছায়াছবির জনপ্রিয় চিত্রনাট্যকার। নাটক রচনা ও অভিনয় দিয়ে নাট্যসাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে একটি হল 'ছেঁড়া তার'।

অ্যারিস্টটল তাঁর 'poetics' গ্রন্থে নাটকের ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন। তার মধ্যে অন্যতম একটি হল 'সংলাপ'। বিশিষ্ট সমালোচক মনে করেন নাটকে সংলাপের ভাষা সৃষ্টিতে যে নাট্যকার যত বেশি সফল সেই নাটক তত বেশি শিল্পসার্থক। চরিত্র কল্পনা ও সেই চরিত্রের মতো করে সংলাপ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই নাট্যকারের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়। সে কারণেই সংলাপকে নাটকের প্রাণ মনে করা হয়। আর এই সংলাপ সৃষ্টি হয় সঠিক ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে।

'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপে যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার 'বাহে' ভাষা। 'ছেঁড়া তার' নাটকের ভাষা বিন্যাসে চরিত্রের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংলাপগুলি বাস্তব হয়ে উঠেছে বলেই চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে জীবন্ত। নাট্যকার নাটকটিতে একদিকে বেশকিছু ভদ্র চরিত্রের মুখে এবং অন্যদিকে কিছু গ্রাম্য কৃষকদের মুখে তাদেরই ভাষা তুলে দিয়েছেন। এখানে দুই ধরনের চরিত্র ও তাদের মুখের ভাষা ব্যবহারে নাট্যকার দক্ষতা দেখিয়েছেন।

নাটকের শহুরে চরিত্রগুলির অন্যতম সাহিমবাবু, রেবেকা, মাসী ও সাহিমবাবুর বন্ধু সুশান্ত। এই

Scanned by CamScanner

চরিত্রগুলির পাশাপাশি রহিমুদ্দি, ফুলজান, হাকিমুদ্দি সরেমামুদ, শ্রীমন্ত, কিয়ামালু, কুকরা প্রভৃতি গ্রাম্য চরিত্রগুলিও এখানে রয়েছে। প্রায় একই সময় একই প্রেক্ষাপটে চরিত্রানুযায়ী এখানে দুটি ভাষার একত্রে সহাবস্থান ঘটিয়েছেন নাট্যকার।

মহিমবাবু, তার ছেলে-মেয়ে, শ্বশুরে ও গ্রাম্যবন্ধু প্রত্যেকের ভাষা সম্বন্ধেই নাট্যকার সচেতন। সচেতন ভাবেই প্রত্যেক চরিত্রানুযায়ী সং. লাপ সৃষ্টি করেছেন —

মায়া । "আহা সব যেন চাষারই করেছে।

ভেবো । চাষারা পেট চালিয়েছে। খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অবসর সময় পেয়ে তোমরা কুঁড়ে পরগাছার দল ওইসব বাজে আবর্জনা সৃষ্টি করেছ।

সুধাংশু । হাঁরে ভেবো, এসব কথা বুঝি কলেজে শিখেছিস?

ভেবো । বাবাইত, এসব কথা বলেন কাকাবাবু - ওই বাবা আসছেন।

মহিম । [হাসি মুখে] সত্যি এসেছে একটি খাঁটি আসল চাষা। কই-রে রহিম আয়। ওখানে কি দেখছিস?

রহিম । ফুল বাগিচাটা দেইখলো।"

এখানে প্রত্যেক চরিত্রের মুখের ভাষাই যেন সলিলার মতো তীব্র গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে গেছে — কোথাও তা চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে হয়নি।

রংপুর জেলায় প্রচলিত 'বাহে' উপভাষাকেই নাট্যকার 'ছেঁড়া তার' নাটকের প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নাটকের নায়ক রহিমুদ্দি তার স্ত্রী ফুলজান প্রতিনায়ক হাকিমুদ্দি, গোবিন্দ, শ্রীমন্ত, সরেমামুদ কিয়ামালু, কুকরা প্রমুখ এই ভাষাতেই কথা বলে। নাটকের

Scanned by CamScanner

স্পষ্ট হয়েছে রাহিমুদ্দি কর্তৃক হাকিমুদ্দির গাই খোঁয়াড়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। পরে রহিমুদ্দি ও হাকিমুদ্দির বিরোধ যে আরো গতি পেয়েছে তা তাদের সংলাপ থেকেই বোঝা যায় —

হাকিম। "[ধমকাইয়া] ক্যানে রে - গাই ক্যান খোঁয়াড়ে দিলু?

রহিম। কি করা যায়। রোজ দিন জিরাত খায়া যায়। আইজ মাথা গরম হয়া গেল।

হাকিম। মাথা তোর অনেক দিন গরম হইছে।

রহিম। কিসে গরম দেইখলেন?

হাকিম। গরম না হইলে চুল্লার মত মাতিগাতি ফুটানী হয়? ব্যাটার কোট-প্যান্টু - বিবির জুতা শাড়ী - নিজে কিনা একটা রাজা —

রহিম। এই কথা? নিজের পয়সা নিজে খরচ করছি - তাতে কার কি?"

দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের মতোই রহিমুদ্দিও দিশেহারা হয়ে পড়ে। স্ত্রী ফুলজান ও পুত্র বছিরকে লঙ্গরখানায় পাঠালে হাকিমুদ্দি তাদের খেতে দেয় না রহিমুদ্দি চৌকিদারী ছাড়্ দ্যায় বলে। বছির ও ফুলজান যাতে খাবার পায় এই ভেবে রহিম ফুলজানকে তালাক লিখে দেয়। সামাজিক সংকটের শিকার ফুলজান তখন ব্যথিতভাবে রহিমুদ্দিকে জানায় —

ফুলজান। কি কল্লুরে! হায় হায়রে কি গোম কল্লু?

রহিম। খাওয়াবার পারি নাই। কিন্তু তোমারে জন্য তোর খাওয়া বন্দ হচ্ছিলে। তাতে তোক ফারখত করি দেনো।

ফুলজান। কোনঠা কল্লু। তার চায়া মারি ফ্যালাও —

Scanned by CamScanner

মারি ফ্যালাও।"

— রহিম যে একজন ন্যায়বদ্ধ স্বামী ও পিতা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রহিমুদ্দি, সুলতান, হাকিমুদ্দি ছাড়া আর যে সমস্ত চরিত্র রয়েছে তাদের সংলাপ রচনাতেও নাট্যকার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রাম্য চাষী শ্রীমন্ত রহিমকে ভালোবাসে। তাই হাকিমুদ্দির গাই খোঁয়াড়ে ঢুকাতে ভবিষ্যতে হাকিমের রাগের আগাম আভাস পেয়ে রহিমুদ্দিকে যে সাবধান করে এই ভাবে —

শ্রীমন্ত । "দাওয়ানীর চোট দেখিস এলায়। মুই তার কাছে সব শুনে আইলো। গাই খোঁয়াড়ে দিছিস্ – ফির ঠক ঠক সমঝান এই সব কাদিস্?

রহিম । ছাড় উয়ার কথা। হামরা যতয় সহ্য করি উয়ার ততয় চোট লাগে।

শ্রীমন্ত । মানুষটা সহজ নয় রে! দারোগা সিপাহিটার সব ভ্যালেয়া ভ্যালেয়া হাত কর্ইছে। এবার নজর আলী আহেন্দ হইয়া আঁয়ায় প্রেসিডেন্ট হইবে। বুদ্ধি উয়ার জবের চোখা।"

আবার গোবিন্দ চরিত্রের মুখেও আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ফুটে ওঠে —

গোবিন্দ । 'পোইরে জল বাস করি কুমিরের সাথে বাদ করি পারবু?"

— এখানে 'পারবু' উচ্চারণ কামরূপী উপভাষারই নিদর্শন। এইভাবে নাট্যকার সারা নাটকে কথ্য ভাষার রূপটিকে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন।

Scanned by CamScanner

এছাড়াও নাট্যকার এই নাটকের গানগুলি ব্যবহার করেছেন তা লোকসংগীত থেকে। এই গানগুলির রংপুরের আঞ্চলিক লোকসংগীত ভাওয়াইয়া নিয়ে এসে-ছেন নাট্যকার। যেমনটা —

না খাওয়া কুটকোটা তার কুটকীর ডাকি কয়
প্যাট না ভাঙিলেরে আমরা কুকী হইল হয়।
হাত পাও ছোটক তোর ছুইটা কবি
প্যাট ভেকেটা হয়
[ফির] এমন করি খুইছেরে দ্যাখে কাটি মন্নানার নয়
রে ভাই কাটি মন্নানার নয়।

পরিশেষে বলা যায়, তুলসী লাহিড়ী নাটকের সংলাপ রচনায় যে সাফল্য এনেছেন তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নাটকটির বিপুল জনপ্রিয়তাই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। রংপুর জেলার যে 'বাহে' আঞ্চলিক ভাষা নাট্যকার এখানে ব্যবহার করেছেন সে ভাষার ক্রিয়া-ধাতু বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহারেও নাট্যকার যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

3. 'ডাকঘর' নাটকে মানবীয় কাহিনীর অন্তরালে যে তত্ত্বকথা রয়েছে নাটকটি অবলম্বনে তা বিচার কর।

অথবা

এডওয়ার্ড টমসন বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি নাটকই এক একটি তত্ত্বের বাহক।" — ডাকঘর অবলম্বনে এই উক্তিটির সার্থকতা বিশ্লেষণ কর।

অথবা

'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথের যে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তার পরিচয় দাও। অথবা ডাকঘরের শ্রেণী বিচার কর।

"তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোনখানে রাখব প্রণাম।"
— দিনেশ দাস।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি যথার্থ। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাট্যধারাটিও শিল্প সৌন্দর্যে অভিনব। এই ধারার শ্রেষ্ঠ নাটক 'ডাকঘর' (১৯১২)। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে রচিত এই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের তত্ত্বকথা প্রকাশিত হয়েছে।

'ডাকঘর' রূপক-সাংকেতিক নাটক। রূপক নাটকের রীতি মেনেই তত্ত্বকথাটি প্রকাশিত হয়েছে একটি মানবীয় কাহিনীর মধ্য দিয়ে। তত্ত্বকথাটি এইরকম —

"এই বিপুল বিচিত্র পৃথিবী- বিশ্বপ্রকৃতি হল ডাকঘর। পৃথিবীর সৌন্দর্য ও আনন্দরাশের প্রতীক হল চিঠি। আর গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এই ছয় ঋতু হল ডাকহরকরা। ঈশ্বর এই ডাকঘরের মধ্য দিয়েই মানুষের কাছে তার সংকেত পাঠান।"

— নাটকে এই তত্ত্বকথাটি ফুটে উঠেছে একটি মানবীয় কাহিনীর মধ্য দিয়ে। অসুস্থ বালক অমল মাধব দত্তের পোষ্যপুত্র। কবিরাজ তাকে বাইরে বেরোতে বারণ করেছে। ঘরবন্দি বালক অমল তাই রাস্তার ধারে জানালা দিয়ে বাইরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে।

Scanned by CamScanner

রাস্তা দিয়ে সেই সময় অমল তার সাথেই কথা বলতে চায়। তার কল্পনা যেন মন গন্ডী অতিক্রম করে সুদূরে চলে যেতে চায়। ইচ্ছে করে দইওয়ালা হয়ে কাঁধে বাঁক নিয়ে দই বিক্রি করতে —

"দই দই ভালো দই।"

প্রহরীকে ডেকে তার সঙ্গেও ভাব জমায়। প্রহরীর কাছ থেকেই সে জানতে পারে রাজা ডাকঘর বসিয়েছেন। রাজার কাছ থেকে চিঠি আসবে। এমনকি অমলের নামেও চিঠি আসতে পারে — "ছেলে মানুষকে রাজা এতটুকু টুকু ছোট্টো ছোট্টো চিঠি লেখেন।" মোড়লকে অমল সেই চিঠির কথা বললে মোড়ল তীব্র ব্যঙ্গ করে —

"হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে! তা লিখবে বৈকি! তুমি যে তার পরম বন্ধু।"

মালিনির মেয়ে সুধা ফুল তুলতে বেরুলে অমল তার সঙ্গেও কথা বলে। সুধাকে সে পারুল দিদি হতে বলে — "তুমি আমার পারুল দিদি হবে।" সুধা ফুল তুলতে চলে গেলে কথা দিয়ে যায় আবার সময় অমলের জন্য ফুল নিয়ে আসবে সুধা। সুধা যখন ফুল নিয়ে আসে তখন অমল ঘুমিয়ে পড়ে অর্থাৎ মারা যায়। সুধা রাজকবিরাজকে ফুল দিলে বলতে বলে — "সুধা তোমাকে ভোলেনি।"

ডাকঘর রচিত হয়েছে গীতাঞ্জলী-গীতালী-গীতিমাল্য কালপর্বে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বাস করেছেন এক আধ্যাত্মিক জগতে। যে জগতে তিনি প্রবেশ করেছিলেন 'সোনার তরী' কালপর্বে —

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

Scanned by CamScanner

কবির সঙ্গে ঈশ্বর তথা জীবন দেবতার চেনাশোনা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম। ক্রমশ সেই জানা-শোনা গভীর হয়েছে। জীবন দেবতার সাথেই বসত করেছেন কবি। নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ জীবনদেবতার সাথেই ভাগ করে নিয়েছেন। জীবন দেবতা তীব্র অনুভবে প্রত্যেক ভাষা শব্দের দোলাতে

'ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল পিয়াস আসি অন্তরে মম।"

'ডাকঘর' নাটকে সেই নাবিকে, সেই মানস সুন্দরী, সেই অন্তরতম প্রকাশ পেল রাজা রূপে। রাজা তথা ঈশ্বর মানুষের কাছে তার সংকেত পাঠান। ঠাকুরদার মতো মানুষেরা তা বুঝতে পারেন। কিন্তু মোড়লের মতো বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই সংকেতের মানে কিছুই বুঝতে পারে না। তাই সে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঠাকুরদা জানেন ঈশ্বর অমলের কাছে আসবেন, অমলকে নিয়ে যাবেন এই মর্ত পৃথিবী থেকে। রাজকবিরাজের সাথে অমলের এই মিলন আসলে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন।

অমলের মৃত্যুতে যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। অমলের ক্ষুদ্র জীবনের ব্যাধির ঔষধ একমাত্র রাজ কবিরাজই জানেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে অভিন্ন ও অসীম আনন্দ সাগরের সঙ্গে যোগসূত্রে হওয়াই তো ওর ঔষধ। তাই তিনি এসে দরজা খুলে দিলেন। আর অমলের ব্যাধির উপশম হল

"আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব — ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও - এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।"

— এই ঘুম বাইরে থেকে মৃত্যু কিন্তু ভিতর থেকে ঈশ্বরের সাথে মিলন। সেই মিলন অনন্ত অভিসার।

Scanned by CamScanner

তাই মানবের শোক ও অসুখের মৃত্যুতে কোনো যন্ত্রণা কিংবা বিকৃতির স্থান নেই। আছে নিশ্চয়তা। রাজ কবিরাজ জীবনগুরুর অনুরূপে অং:রূপে খবর দিয়েছেন —

সুধা ॥ ও কখন জাগবে ?

রাজকবিরাজ ॥ এখনি, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা ॥ তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে?

রাজকবিরাজ ॥ কী বলব ?

সুধা ॥ বল যে 'সুধা তোমাকে ভোলেনি'।

রাজ কবিরাজের এই অং:শটা আর মর্ত জীবনের অং:শটা এক নয়। এ হল অমর্ত জীবন থেকে উঠে আসা বাণী। যেখানে থাকে সেই জীবনদেবতা। এখন থেকে অমলও তার কাছেই থাকবেন। এভাবেই অভিনব আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে ঈশ্বর মিলনের তত্ত্বকথা।

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন থেকেই 'ডাকঘর' নাটকের জন্ম। তাই ঈশ্বর তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে এখানে। যাকে তিনি একদা মানবিক রূপে দেখেছিলেন। যে মানসসুন্দরীর নৌকায় তিনি একদা উঠেছিলেন, তাকেই 'ডাকঘর' নাটকে দেখালেন। রাজা রূপে পৃথিবীতে উপলব্ধি করলেন। রাজার 'ডাকঘর' দূরে মানুষের কাছে তিনি তার চিঠি পাঠিয়েছেন। কেউ বুঝতে পারেন কেউ বুঝতে পারেন না —

"নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।"

Scanned by CamScanner